যাচ্ছে—তা নিয়েও তার কোনো কৌতূহল নেই। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক জীব হিসাবে সে নিজের জীবন যাপন করে না, অন্যের হয়ে জীবনযাপন করে। হাইডেগার *das Mann*-এর অবস্থানটিকে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন :

'Everyone is the other and no one is himself. *Das Mann* which supplies the answer to the question of the "*who*" or everyday Dasein has already surrendered itself in being-among-one-another.

নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধানে *das Mann*-এর সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নেই। জনগণের একজন হয়েই তাকে সবকিছু করতে হবে। তাই *das Mann* কোনো ঝুঁকি না নিয়ে জনতার ভিড়ে মিশে যায়, যাতে তাকে আলাদা করে সনাক্ত না করা যায়। স্বাধীনতার গুরুদায়িত্ব এড়ানোর জন্য একঘেয়ে প্রাত্যহিক জীবনযাপনের প্রতি সে প্রলুব্ধ হয়, ফলে তার নৈতিক পতন ঘটে, যার থেকে সৃষ্টি হয় অসার্থক বা অযথার্থ অস্তিত্ব (inauthentic existence)। এ বিষয়ে হাইডেগারের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

'The self of everyday is *das Mann-self*, which we distinguish from the authentic self—that is, from the self which has been taken hold of its own way. As *das Mann-self*, the particular Dasein has been dispersed into *das Mann* and must first find itself. This dispersal characterized the "subject" of that kind of Being which we know as concernful absorption in the world we encounter as closest to us.'

সার্থক অস্তিত্ব এবং অসার্থক অস্তিত্ব (Authentic and Inauthentic Existence)

হাইডেগার Dasein-এর দুটি প্রকারের কথা বলেছেন—সার্থক অস্তিত্ব এবং অসার্থক অস্তিত্ব। অস্তিত্বের এই প্রকারগুলি মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে নির্দেশ করে। সার্থকভাবে অস্তিত্বশীল মানুষের নিজের সম্পর্কে পর্যাপ্ত উপলব্ধি আছে, সে জানে তার প্রকৃত স্বরূপ কি। অপরদিকে অসার্থকভাবে অস্তিত্বশীল মানুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে চায় না, অন্ধভাবে দিনযাপনের গ্লানিকেই সে সাদরে বরণ করে নেয় দায়িত্বের বোঝা লঘু করার লোভে। কিন্তু সার্থক এবং অসার্থক অস্তিত্ব—উভয়ই Dasein-এর সম্ভাবনাকে সূচিত করে। হাইডেগারের মতে সত্তাগত দিক থেকে উভয়ই Dasein-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য (existentalia)। অনন্ত

সম্ভাবনাময় অস্তিত্ব, তথ্যতা ... যোগ্যতা ... সার্থক অস্তিত্বের মানুষ সার্থক অস্তিত্বময় জীবনযাপন করার যোগ্যতা ... নৈতিক পতনের সম্মুখীন হয়ে ক্ষেত্রে মানুষ তার অসীম সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে, নৈতিক পতনের সম্মুখীন হয়ে ফলে নিম্নস্তরের অস্তিত্বের গ্লানি ভোগ করে। আদর্শ বা সার্থক অস্তিত্ব লাভের জন্য কঠোর সংগ্রামের প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নৈতিক অধঃস্তরের দিকে ধাবিত হবার একটা প্রবণতা থাকে এবং তার সব কাজকর্মই অসার্থক অস্তিত্বের রঙে রঞ্জিত। মানুষের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল নিজের প্রকৃত স্বরূপকে অস্বীকার করা। যেখানে আত্মবিস্মৃতির শিকার হয় সে এবং এমন সমস্ত সাধারণ কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে মনুষ্যজীবনের সার্থকতার জন্য, যেগুলি একেবারেই মূল্যহীন। অন্য ব্যক্তির সঙ্গে নিজের অভিন্নতা প্রদর্শন করে সে এমন ভান করে, যেন এই দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবন নির্বাহ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। নিজের অন্তরে স্থিত অনন্ত সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে সে বেছে নেয় আত্মবিস্মৃত অস্তিত্বের এই বিকৃত রূপটিকে। নিজের স্বরূপ জানার জন্য সংগ্রামকে প্রত্যাখ্যান করে সে দৈনন্দিন কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এককথায়, *das Mann*-এ পরিণত হতে পারলেই তার তৃপ্তি। কারণ এই অবস্থায় তাকে নিজের অস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করতে হবে না, সে অনায়াসে লক্ষ জনের একজন হয়ে পড়তে পারবে। গড্ডলিকাপ্রবাহের মতো বেশিরভাগ লোক যেদিকে মত দেবে, নিরাপদে সে সেই মতকেই গ্রহণ করবে। তার সাফল্যের বা ব্যর্থতার মাপকাঠি হবে অনামা (anonymous) জনগণ কর্তৃক রচিত সাধারণ তুলাদণ্ড। অসার্থক অস্তিত্বের চরম স্তরে মানুষ জনগণের ধারণাগুলিকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে। সর্বসাধারণের মানদণ্ডে নির্ণীত হয় তার জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা। তথাকথিত সার্থক অস্তিত্ব লাভের মিথ্যা ভান ছলনা করে যথার্থ অস্তিত্বের আদর্শকে। এইভাবে হাইডেগার *das Mann*-কে সার্থক অস্তিত্বের প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন।

জগতের তিন প্রকার ব্যাপ্তি নিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয় সার্থক অস্তিত্ব। এক, জগতে

...র্থকে। ... আচরণেরও
তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, অসার্থক মানুষ নিজেকে পূর্ব থেকে জগতে প্রক্ষিপ্ত বলে স্বীকার করে না। সে নিজেকে খুঁজে পায় এলোমেলো বিশৃঙ্খল অবস্থায়। প্রাত্যহিক কাজকর্মের চোরাবালিতে ডুবতে ডুবতে হারিয়ে যায় তার নিজস্ব সত্তা। অসার্থক অস্তিত্বের স্তরে Dasein-এর প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে বোধ বা জ্ঞান জাগ্রত হয় না। তার নিজের উপলব্ধি আর *das Mann* প্রদত্ত তথ্যগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা তার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে।

কৌতূহলের প্রথম উদ্ভব হয়, যখন মানুষ নিজের অনন্ত সম্ভাবনাময় অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম সচেতন হয় এবং সে-সম্পর্কে প্রশ্ন করার এবং কৌতূহল প্রকাশ করার প্রবণতা দেখা দেয় তার মধ্যে। এই কৌতূহল থেকেই জন্ম হয় বুদ্ধিমত্তার, পণ্ডিতসুলভ মনোভাবের এবং বিজ্ঞানমনস্কতার। কিন্তু তখনও সে অযথার্থ অস্তিত্বের স্তরেই বাস করে, কাজেই সকল বিষয়ে আলোচনা করলেও নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় প্রশ্নটি তখনও মুলতুবি থাকে। কৌতূহলী মানুষ যে পরিকাঠামোয় কাজ করে তা অপরের দ্বারা নির্মিত, তবে সেই পরিকাঠামোর ভিতরে সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান বা চালাক বলেই প্রতিপন্ন হয়। শুধু নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় প্রশ্নটিই তার মনে জাগ্রত হয় না, কারণ অযথার্থ বা অসার্থক মানুষের আলোচনা আর যথার্থ বা সার্থক মানুষের আলোচনার উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বর্তমান। অযথার্থ মানুষ বড়জোর কৌতূহলী হতে পারে, নিজের সীমিত গণ্ডির মধ্যে তার বুদ্ধিমত্তা বা বিষয়বুদ্ধির পরিচয় রাখতে পারে, কিন্তু তার নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জানার ইচ্ছা তার কখনই হয় না। এটিকে সে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে। অসার্থক মানুষের কথাবার্তাকে 'অনর্থক বকে যাওয়া' বা 'নিছক গল্প করা' (prattle or chatter)—এইভাবে প্রকাশ করেছেন হাইডেগার। এটিরও একপ্রকার বক্তব্য আছে, কিন্তু তা নিজের স্বরূপ সম্পর্কীয়

একটি ক্ষুদ্র অংশ দখল করে আছে অসার বিষয়ে বাক্যব্যয়। কিন্তু হাইডেগারের মতে বেশিরভাগ লোক শুধুই অসার কথায় ব্যাপৃত থাকে। ভাষাই সার্থক অস্তিত্বের দরজার আগল খুলে দেয়। যথার্থ এবং অযথার্থ অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্যের বোধ জাগ্রত করে ভাষা। আমাদের সম্ভাবনাগুলিকে বোঝার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল 'কথা' নানাবিধ রচনা এবং সত্তা সম্পর্কীয় আলোচনা। কিন্তু যদি নিছক দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সম্বন্ধীয় টুকিটাকি কথায় আমরা সবসময় নিজেদের নিয়োজিত রাখি, তাহলে সত্তা সম্পর্কীয় চিন্তাভাবনা ব্যাহত হয়। হাইডেগার মনে করেন, কাব্যের ভাষাই সার্থক বা যথার্থ অস্তিত্ব প্রকাশের পক্ষে আদর্শ। অস্তিত্বের নানাবিধ সম্ভাবনা কাব্যের ভাষায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু একজন ব্যক্তি অনেক সময় অন্যদের কথার পুনরাবৃত্তি বা নকল করতে পারে। আসল বক্তব্যটি সত্তা সম্পর্কীয় গভীর আলোচনা হতে পারে কিন্তু সেই কথাগুলি যদি কেউ হুবহু পুনরাবৃত্তি বা নকল করে—তা অসার্থক অস্তিত্বকে সূচিত করে এবং সার্থক অস্তিত্বের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ করে অন্যের মতাদর্শ প্রচার করলেও সার্থক অস্তিত্ব লাভ করা যায় না। হাইডেগার তাঁর রচনার বিভিন্ন অংশে অসার্থক ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ভাষা *das Mann*-এর ভাষা, যার প্রয়োগরীতি বা মূল্যায়নের মাপকাঠি এমন যে, সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত ভাষা কখনই কারুর নিজস্ব হতে পারে না। এইজন্যই হাইডেগার কাব্যের ভাষার উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ, এটি সাধারণ ভাষার চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের। রোজকার ব্যবহারযোগ্য ভাষার ব্যাকরণের বিচিত্র প্রয়োগ দার্শনিক সঙ্কটের সৃষ্টি করে। তাঁর মতে জ্ঞানতত্ত্বে যে অন্ধভাবে উদ্দেশ্য এবং বিধেয়র মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে ব্যাকরণের উদ্দেশ্য-বিধেয় ভেদ থেকেই জন্মলাভ করেছে। প্রাত্যহিক কথোপকথনের ভাষাকে ভাবপ্রকাশের নৈর্ব্যক্তিক, অস্বচ্ছ এবং অগভীর যন্ত্র হিসেবে তৈরি করেছে *das Mann* এবং তাই তা দার্শনিক সত্য প্রকাশের অযোগ্য। কাব্যের ভাষায় গভীরে অনুসন্ধান করে আমাদের এমন একটি ব্যক্তিগত ভাষা (private language) চয়ন করতে হবে, যার মাধ্যমে দার্শনিক তথা আত্মিক সত্যের প্রকাশ ঘটে। হাইডেগার সম্ভবত তাঁর প্রথমদিকের রচনাগুলির সময় ব্যক্তিগত ভাষার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আপত্তিগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না এবং এটিও সুস্পষ্ট নয় যে, ব্যক্তিগত ভাষার কতখানি প্রয়োগ অন্য ব্যক্তিদের কাছে করা যায়। তাঁর রচনার মধ্যবর্তী যুগে তিনি সত্তা সম্পর্কীয় আলোচনার পক্ষে পর্যাপ্ত সম্ভাবনাকে স্বীকার করেছিলেন। শেষদিকের রচনায় তিনি সর্বপ্রকার ভাষার ব্যবহারকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ এই সময়ে তিনি বুঝতে পারেন যে ব্যক্তিগত ভাষা বীয়িং সম্পর্কীয় সত্য উদ্ঘাটনে

অক্ষম। প্রকৃতপক্ষে
পারে না। অতঃপর
আমাদের নেই।
ভাষা দিয়ে সত্তার
নিজস্ব কাব্যের
কাব্যের ভাষাও
হাইডেগার বীয়িং
যদি বীয়িং-এর
হিসাবেই আমাদে

এখন প্রশ্ন হ
প্রথমেই বলা যা
সকলের মাঝে নি
করা যায়, তবে
সর্বসাধারণের বা
বার নিরাপত্তার
সর্বদাই *das Ma*
মনে করেন, মানু
মাঝে মাঝে এ
অস্তিত্বের নিরাপ
তখনই মানুষ
মনোবৃত্তি নিয়ে
ক্রমশ পরিচয়ই
হাঁপিয়ে ওঠে
থেকে। হাইডে
বীয়িং সম্পর্কে
শঙ্কা (dread
নিজের অস্তিত্ব
কিছু কিছু অজা
ছাড়াও জাগতি
অপরাধবোধ
দ্বারাই সে নি

অক্ষম। প্রকৃতপক্ষে কোনো ভাষাই এই সুগভীর সত্যকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। অতঃপর তিনি বললেন, বীয়িং-কে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতাই আমাদের নেই। যে কোনো ভাষা সাধারণভাবে *das Mann*-এর ব্যবহৃত ভাষা। এই ভাষা দিয়ে সত্তার বিভিন্ন দিকগুলিকে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এমনকি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব কাব্যের ভাষার সাহায্যেও বীয়িং-এর স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, কারণ কাব্যের ভাষাও ভাষা প্রয়োগের সাধারণ রীতিগুলির উপর নির্ভরশীল। এইভাবে হাইডেগার বীয়িং-এর স্বরূপকে ক্রমশ রহস্যময় করে তুললেন। কোনো ভাষা দিয়েই যদি বীয়িং-এর স্বরূপ বোঝানো সম্ভব না হয়, তাহলে বীয়িং একটি রহস্যময় সত্তা হিসাবেই আমাদের কাছে চির অজ্ঞাত থেকে যাবে।

এখন প্রশ্ন হল, মানুষ অসার্থক অস্তিত্বের প্রতি ধাবিত হয় কেন? এর উত্তরে প্রথমেই বলা যায়—এই প্রকার জীবনযাপন অত্যন্ত সহজ সরল। নির্নাম জগতে সকলের মাঝে নিজেকে লুকিয়ে রেখে দিব্যি আরামে যদি নিরাপদ জীবন অতিবাহিত করা যায়, তবে সার্থক অস্তিত্বের যন্ত্রণাক্লিষ্ট কঠিন জীবন ভোগ করার প্রয়োজন কি? সর্বসাধারণের বাসযোগ্য জগত যেন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং তা বারং বার নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে মোহগ্রস্ত করে রাখতে চাইছে সাধারণ মানুষকে। কিন্তু সর্বদাই *das Mann*-এর আপাত শান্তির জীবন কাটানো বোধহয় সম্ভব নয়। হাইডেগার মনে করেন, মানুষ কখনই সম্পূর্ণভাবে অসার্থক অস্তিত্ব ভোগে সমর্থ হয় না। কারণ মাঝে মাঝে একঘেয়ে জীবনযাপনের গ্লানি তার বিবেককে দগ্ধ করে, অসার্থক অস্তিত্বের নিরাপত্তার বেড়া ডিঙিয়ে উঁকি দেয় সার্থক অস্তিত্বের উজ্জ্বল কিরণ—তখনই মানুষ উপলব্ধি করে যে, সার্থক অস্তিত্বের দায়বদ্ধতা থেকে পলায়নের মনোবৃত্তি নিয়েই সে *das Mann* নির্দেশিত জীবনযাপন প্রণালীকে বেছে নিয়েছে। ক্রমশ পরিচয়হীনভাবে লুকিয়ে থাকার যন্ত্রণা এবং প্রাত্যহিক সাধারণত্বের চাপে হাঁপিয়ে ওঠে সে। সার্থক জীবন সম্পর্কে সচেতনতা আসে একটি বিশেষ আবেগ থেকে। হাইডেগার একে বলেছেন শঙ্কা (dread)। এটি সাধারণভাবে জগত-সম্পৃক্ত বীয়িং সম্পর্কে শঙ্কা। আরও ভালভাবে বলতে গেলে, এটি কোন কিছু-না-থাকার-শঙ্কা (dread of nothing)। প্রথমে মানুষের মনে মৃত্যুভয় জাগে এবং দ্বিতীয়ত, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কিত শঙ্কার উদ্রেক হয়। আধোচেতনার ঘোরে মানুষের মনে কিছু কিছু অজানা আশঙ্কা জাগে এবং তার মধ্যে প্রথমটিই হল মৃত্যুভয়। তবে মৃত্যুভয় ছাড়াও জাগতিক বস্তু সম্পর্কে চরম বিতৃষ্ণা এবং অসার্থক জীবনযাপনের জন্য অপরাধবোধ আমাদের কিছু-না-থাকার শঙ্কাকে জাগিয়ে তোলে। এই শঙ্কার আবেগের দ্বারাই সে নিজের অসার্থক অস্তিত্বের গ্লানি থেকে পলায়নের পথ খোঁজে। অসার্থক

অস্তিত্বের মোহাচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তার আশ্বাসের দ্বারা মানুষ যেমন দায়মুক্ত সু
জীবনযাপনের পথ বেছে নেয়, তেমনি শঙ্কার আবেগের দ্বারা সে অনন্য সম্ভাবনা
অস্তিত্বের (Existenz) স্বরূপকে উপলব্ধি করে। অসীম সম্ভাবনাজনিত অপূর্ণ
(Angst) দ্বারা তাড়িত হয়ে যখন নিজের জীবনের দায়ভার তাকেই বহন করতে হয়
তখন জগত-সম্পৃক্ত বীয়িং-কে তার সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে হয়। নির্দিষ্ট
প্রদত্ত মান (standard), প্রদত্ত মূল্য এবং নিজের সম্পর্কে একটি প্রদত্ত ধারণার
অভাবে সে হয়ে পড়ে দিশাহারা।

এই অভাব এবং অসীম শূন্যতাবোধ থেকে পরিত্রাণের জন্য Dasein নিজ
স্বরূপ উপলব্ধি করার পরও অসার্থক অস্তিত্বকে শ্রেয় বলে মনে করে, অথচ এ
প্রকার অস্বস্তিতেও ভোগে। শঙ্কার আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে সবকিছুই তার কা
তাৎপর্যহীন মনে হয়। সবকিছুকে তাৎপর্যহীন বলে স্বীকার করলে, পুনরায় সা
অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে মানুষ। শঙ্কার আবেগ আমাদের চোখে আঙ
দিয়ে দেখায় যে, আমরা জগত থেকে কিছুই নিই না বরং আমাদের অস্তিত্বের দ্বারা
জগত তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। জগত সম্পর্কে এই সচেতনতা আমাদের অস
অস্তিত্বের মূল ধরে নাড়া দেয়। শঙ্কার আবেগে জগতকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে মনে
হয়, কারণ তা আমাদের সকল প্রদত্ত বস্তুকে অন্ধভাবে স্বীকার করার মনোভাব
বিনাশ করে এবং পরিবর্তে মনে একটি অদ্ভুত অস্বস্তি জাগিয়ে তোলে। আমরা
পারি নিজের জীবনের সব দায়িত্ব বহন করতে, না পারি এই দুঃসহ জীবন
পরিত্যাগ করে জনতার ভিড়ে মিশে গিয়ে নিরাপদ অসার্থক অস্তিত্বকে হাসিমুখে গ্র
করতে। এইভাবে শঙ্কার আবেগের পথ ধরে ধীরে ধীরে সার্থক অস্তিত্বে পু
উত্তরণ ঘটে আমাদের। নিরাপদ সুখী জীবন সুদূরপরাহত হয়ে যায়, পরিবর্তে স্বা
নির্বাচন ক্ষমতার অধিকারী হই আমরা। জ্যোতির্ময় সত্তা বিরাজমান হয় আমাদের
মধ্যে।

কিন্তু প্রশ্ন করা যেতে পারে, দুর্বিষহ বেদনাময় সার্থক অস্তিত্বের জীবন যে
লোকের কাছে কি গ্রহণযোগ্য হবে? এর উত্তরে হাইডেগার বলেন, শঙ্কার আ
আমাদের বাধ্য করে শেষপর্যন্ত এই আরামসাধ্য স্বাধীন জীবন গ্রহণ করতে। শঙ্কার
অবস্থায় সর্বত্র যে অসীম শূন্যতা বিরাজ করে, তাও অসহনীয় কষ্টের কারণ। এ
একবার স্বাধীনতার উপলব্ধি হলে, সাধারণভাবে বন্দী জীবনও তার আর পছ
না। ফলে সার্থক অস্তিত্বকে বরণ করে নেবার জন্য বিবেকের আহ্বান সে শু
পায়, যা পরিকল্পনাপ্রসূত নয় এবং ইচ্ছাপূর্বক কেউ একে প্রয়োগও করে না।
বিবেকবোধই আমাদের সার্থক অস্তিত্বের পথে পরিচালিত করে। কিন্তু হাইডেগার

বিরুদ্ধে ... —তার সঠিক কোনো কারণ তিনি উল্লেখ করেননি। ফলে আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, অসার্থক জীবন গ্রহণ করার পক্ষে পর্যাপ্ত যুক্তি প্রদান করলেও সার্থক জীবন গ্রহণ করার পক্ষে তেমন কোনো সঠিক যুক্তি তিনি দিতে পারেননি।

অনিত্যতা এবং Dasein-এর সারধর্ম নিরূপণতত্ত্ব (Temporality and Hermeneutic Phenomenology)

জগত-সম্পৃক্ত সত্তার (Being-in-the-world) ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে নিরন্তর কালপ্রবাহের (temporality) ধারণা। মানুষের জীবনে কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কাল যদি অনিত্য না হত, আমাদের জীবন যদি কালপ্রবাহের দ্বারা সীমিত না হত, তাহলে মানুষের সঙ্গে জগতের মৌলিক সম্পর্কটিও স্থাপিত হত না। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত—কালের এই তিনটি পর্যায়ের মধ্যেই মানবজীবন সীমিত। কালের অনিত্যতার ধারণা না থাকলে আমাদের জীবনে না থাকত উদ্বেগ, না থাকত মৃত্যুভয়। আমাদের জীবনের তিনটি অধ্যায় অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে আমরা তিনটি স্বতন্ত্র উপায়ে সচেতন থাকি। আমাদের জন্ম স... ও স্থান, পিতামাতার পরিচয়, শিক্ষাকাল—অর্থাৎ আমাদের অতীত সম্পর্কে আ... সচেতন। যে মুহূর্তগুলি আমরা এখন কাটাচ্ছি, অর্থাৎ এখন যা ঘটছে এবং যে ...